OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 50
Website: https://tirj.org.in, Page No. 450 - 459
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 450 - 459
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় মৃত্যু প্রসঙ্গ

জুলিয়েট দীপা বিশ্বাস
গবেষক, বাংলা বিভাগ
সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়, পুরুলিয়া
Email ID : biswasjulietdeepa@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
বোহেমিয়ানিজম, গোরস্থান, ট্রামলাইন, অন্ধকার, টিউকল, স্বেচ্ছাচারী, দীপ্যমান, মাইলপোস্ট, পরশুরাম, চন্দ্রবোড়া।

Abstract
The poet of the 50th century, shakti chattapadhyay. Though he was the poet of 50th century but his poetic genius blossomed in the 60s and 70s. He was a highly acclaimed and well known poet. He was born in 1933 in bohudu near jaynagar, south 24 pargana district. In childhood he lost his father so he was raised under the care of his grandfather. After dwelling in bohudu, in his childhood, he came to kolkata as a young man and began a new chapter of his life. He studied there. He was a very intelligent student. while studying honors in bengali at presidency college, his career path gradually changed. He entered the literary word not through any small piece but with a whole novel. then inspired by his friends he composed a sonnet sequence. Which he named 'yam'. After that he wrote enormous number of poetry and poems. his first published poetry collections were 'he prem he noishabda' (1961), 'Dharme acho jirafeo acho' (1965), 'Hemanter aranye ami postman' (1969), 'Jete pari kintu keno jabo' (1982), etc. However he received sahitya academy award for his poetry collection 'Jete pari kintu keno jabo'.

The seed of death was embedded in from his incipience. So perhaps the description of death has come back again and again in his poetry in various ways. In his first poem 'yam' he portrayed death as krishnarupmoyee, revealing his love for death. The dual portrayal of life and death is seen in shakti chattapadhyay's poetry after jibananda Das. we have never before witnessed such a poignant celebration of death by any other poet. He used extraordinary symbolism, imaginary and metaphor in his poetry to depict the various aspect of death. he was a playful poet so he didn't want to die, or yet go alone or untimely. That's why we hear him to say 'not to go alone untimely'. Expressing his complex views on death sometimes fearing it, sometimes accepting it as forthcoming. Sometimes ha has seen death in a playful way and sometimes, as a pilgrim on the path. There is a detail description in the main topic. My discussion topic is 'the notion of death in the poem and poetry of shakti chatttapadhay'. But we cannot say that he only wrote about death. Infact

he established with great honor in the branches of bengali literature and will remain so.

Discussion

কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় পঞ্চাশের দশকের কবি হলেও তাঁর কবি প্রতিভার বিকাশ ঘটে ষাট ও সত্তরের দশকে। তাঁর সমকালীন কবিদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আলোচিত ও জনপ্রিয় কবি ছিলেন তিনি। জন্মগ্রহণ করেন ২৫ এ নভেম্বর ১৯৩৩ এ দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার জয়নগরের নিকটবর্তী বহুড়ুতে। তাঁর দাদামশাইদের পুরোনো শিরিকি বাড়ির সার্বজনীন কোনো আঁতুড়ঘরে। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের বাল্যকাল কেটেছে পিতৃমাতৃহীন বহুড়ুতে দাদামশাইয়ের তত্ত্বাবধানে। কবি নিজেই বলেছেন—

> "বাবা মারা গেলেন যখন আমার নামমাত্র বয়স, তারপর থেকেই মামার বাড়ির গলগ্রহ - মা আর ছোট ভাই মামার বাড়ির সংসারে - কলকাতায়। আর আমাকে দাদু রেখে দিলেন তাঁর কাছে একাকী, মানুষ করবার জন্যে। সে বাড়িতে মানুষ ছিল তিনজনই। দাদু আমি আর আমার এক বালবিধবা মাসি।"[১]

বহুড়ুতে ছেলেবেলা কাটিয়ে জীবনের পরবর্তী অধ্যায় শুরু হয় কলকাতা থেকে। সেখানেই পড়াশোনা করেন। পড়াশোনায় তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তাঁর পড়াশোনা নিয়ে অমল গঙ্গোপাধ্যায় 'আমাদের দাদাভাই' শীর্ষক আলোচনায় বলেছেন-

> "শক্তির ম্যাট্রিক ও আই এর ফলও খুব উজ্জ্বল। সিটি কলেজে সে ছিল নিষ্ঠাবান ছাত্র। ...প্রেসিডেন্সি কলেজে বাংলায় অর্নাস নিয়ে পড়তে শুরু করার পরই সম্ভবত শক্তির রোজনামচায় পরিবর্তন এল। এই সময় থেকেই রাতে সদর দরজা বন্ধ হয়ে গেলে পিছনে লোহার সিঁড়ি দিয়ে ফেরা শুরু হল, ওর জন্য বরাদ্দ হল ঢাকা দেওয়া খাবার— তাও কোনদিন খেয়ে কোনদিন না খেয়ে শুয়ে পড়ত ও। ...বহির্মুখী জীবনচর্যার সূচনা-লগ্নটি এখানে সহজেই চিহ্নিত হতে পারে। মফসসলে বড় হওয়া মেধাবী ছেলের, প্রেসিডেন্সির জাঁক সামলাতে না পেরে, কিছুটা বেপথু হয়ে যাওয়ার শৌখিন বোহেমিয়ানিজম, এটি ছিল না। নিজের মধ্যেকার ভাঙচুরকে, যাপনে এবং সৃজনে ছড়িয়ে দিতে চাওয়ার, এটিই ছিল শুরুর পদক্ষেপ।"[২]

কবির প্রথম সাহিত্যকর্ম শুরু হয়েছিল গদ্য দিয়ে, গল্পটল্প নয়, একেবারে গোটা একটা উপন্যাস দিয়ে। তবে তিনি বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতে দিতে তর্কে বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন এবং চ্যালেঞ্জ নিয়ে উত্তেজিত হয়ে পদ্য লেখা শুরু করেছেন। তিনি নিজেই বলেছেন—

> "রাত্রিবেলা বাড়ি ফিরে হিসেব মিলিয়ে একটা সনেট খাড়া করি। পরেরদিন সুনীলের বাসায় যাই। লেখাটা অতি সাধারণ যম, ওর কাছে থেকে কবিতা-র ঠিকানা নিয়ে বুদ্ধদেব বসুকে পাঠাই। সামান্য সংশোধিত হয়ে সে লেখা প্রকাশিত হয়; আর বুদ্ধদেবের স্বীকৃতি–জ্ঞাপক চিঠির প্রেরণাতেই 'সুবর্ণ রেখার জন্ম' আর 'জরাসন্ধ' নামে আরো দুটি গদ্য কবিতার জন্ম হয়। 'সুবর্ণ রেখার জন্ম' কৃত্তিবাসের জন্য রেখে দিয়ে পরের ডাকেই 'জরাসন্ধ' বুদ্ধদেবের কাছে পাঠাই, পদ্য লেখার আকস্মিক জন্ম; প্রকৃতপক্ষে সেদিনই। কোনো প্রেরণা না কোনো সনির্বন্ধ ভালোবাসায় না– শুধুমাত্র চ্যালেঞ্জ এর মুখোমুখি এসে এইসব পদ্য লেখা।"[৩]

এরপর থেকেই তিনি একের পর এক কাব্য কবিতা লিখে চলেছেন। অজস্র কবিতা লিখেছেন। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ - 'হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য' (১৯৬১), 'ধর্মে আছো জিরাফেও আছো' (১৯৬৫), 'তিন তরঙ্গ' (১৯৬৫), 'হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান' (১৯৬৯), 'যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো' (১৯৮২) প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ। তবে তিনি 'যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো' কাব্যগ্রন্থটির জন্য ১৯৮৩ সালে সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার পেয়েছেন।

আমার আলোচ্য বিষয় 'মৃত্যু প্রসঙ্গ শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায়'। মৃত্যু কবির চোখে সেই বালক বয়স থেকেই ধরা পড়েছে। কবির যখন সাত বছর বয়স, তখন কবির বাবার মৃত্যু হয়। সেই মৃত্যু কবির মনে গভীর ছাপ ফেলেছে। কবি তাঁর স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে মৃত্যুবোধের কথা ব্যক্ত করেছেন—

> "বাবার কথা তেমন বিশেষ মনে পড়ে না - শুধু যেখানে ঐ বড়ুর বিশ্বজাঙ্গালে তাকে পুড়িয়ে এসেছিলো এক শিশু – সেখানে গেলে তার পাশের রাস্তা দিয়ে হেঁটে পার হতে পারিনি কোনোদিন।"[৪]

তাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতা 'যম' সেখানে তিনি নিজেই কৃষ্ণরূপময়ী মৃত্যুর প্রতি তাঁর ভালোবাসার কথা লিখেছেন। জীবন ও অস্তিত্বের অনিবার্য পরিনাম হল মৃত্যু। এই মৃত্যু প্রসঙ্গ কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় ঘুরে ফিরে এসেছে বারবার এসেছে বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন রূপে। জীবন ও মৃত্যুর এমন মিশ্র আলেখ্য জীবনানন্দ দাশের পর শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় পাই। শঙ্খ ঘোষ শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সম্পর্কে বলেছিলেন—

> "শক্তির কবিতা হলো জীবনের ভিতর দিয়ে মৃত্যু মোহনার দিকে যাত্রা।"[৫]

আবার সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সম্পর্কে বলেছেন—

> "মৃত্যুচেতনা তার কবিতার বিশেষত্ব হতে পারে, মৃত্যু বাসনা তার কখনও ছিল না... আসলে সে মৃত্যুকে চ্যালেঞ্জ করেছে। মৃত্যুর সঙ্গে দ্বন্দ্ব, আবার তার রহস্যময়তার প্রতি অপার কৌতুহল। কোনও কোনও সময় আবার সে মৃত্যুকে অতিক্রম করেছে। জীবনকে ভালোবেসে তার কবিতা।"[৬]

কবির তো জন্মলগ্ন থেকেই মৃত্যুবোধের বীজ নিহিত ছিল। জন্ম আর মৃত্যু যেন একই মুদ্রার দুই পিঠ। অস্তিত্ব রক্ষার দুই মেরুবিন্দুর এক অলক্ষ্য রহস্যসূত্রে বাঁধা—

> "In my beginning in my end"[৭]

এই পংক্তিতিটির সঙ্গে মিল আছে বহু কবিতায়—

> "হাঁটতে-হাটতে হাঁটতে-হাটতে
> একসময় যেখান থেকে শুরু করেছিলাম সেখানে
> পৌঁছতে পারি পথ তো একটা নয়
> তবু সবগুলোই ঘুরেফিরে শুরু আর শেষের কাছে বাধা
> নদীর দুপ্রান্তেই কূল। একপ্রান্তে জনপদ অন্যপ্রান্ত জনশুন্য
> দুদিকেই কূল, দুদিকেই এপার-ওপার, আসা-যাওয়া
> টানাপোড়েন। দুটো জন্মই লাগে
> মনে-মনে কম করে দুটো জন্মই লাগে।"

কবির প্রথম কাব্যের পাতায় মৃত্যু ও বিপন্নতার অজস্র চিত্র ও অনুষঙ্গ ছড়ানো রয়েছে। ঐ কাব্যের 'জরাসন্ধ' কবিতায় দেখি—

> "আমাকে তুই আনলি কেন, ফিরিয়ে নে।"

কবিতার শেষ স্তবকে দেখি -

> "তবে হয়তো মৃত্যু প্রসব করেছিস জীবনের ভুলে
> অন্ধকার আছি, অন্ধকার থাকবো, বা অন্ধকার হবো।"

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 50
Website: https://tirj.org.in, Page No. 450 - 459
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কোনো কবির আত্মপ্রকাশ এমন কাতর বিহ্বলতায় তা এর আগে আর কখনো শুনেছি বলে তো মনে হয় না।

জীবন ও মৃত্যু কবির কবিতায় পরস্পরের সহযোগী বা পরিপূরক হিসেবে ওঠে এসেছে, তা আমরা দেখতে পাই। দেখতে পাই তিনি একদিকে 'অপরূপ পৃথিবীর' কথা বলেছেন আবার অন্যদিকে সুদীর্ঘ জীবনের উদ্বৃত্ত উপভোগের লোভে আসক্তি জনিত যন্ত্রণার শিকার হতে না চেয়ে 'চতুরঙ্গ' কবিতায় বলেছেন—

> "আহা বেশিদিন বাঁচবো না আমি বাঁচতে চাই না
> কে চাইবে রোদ আচিতা অনল, কে চিরবৃষ্টি?
> অনভিজ্ঞতা বাড়ায় পৃথিবী, বাড়ায় শান্তি
> প্রাচীন বয়সে দুঃখশ্লোক গাইবো না আমি গাইতে চাই না।"

কবির কবিতায় মৃত্যু প্রসঙ্গ এসেছে বারবার। শ্মশান, চিতাকাঠ, চিতাগ্নী, শবযাত্রী ইত্যাদি প্রসঙ্গকে চিত্রকল্প হিসেবে ফুটিয়ে তুলেছেন অসাধারণ দক্ষতার সাথে। তিনি তো প্রায় খেলাচ্ছলেই মৃত্যুকে দেখেছেন—

> "মৃত্যু, তুমি খাপছাড়া ইস্কুলের টিফিনের ছেলে/ কেউ কাছে কেউ দূর
> টিউকল, গোলপোস্ট, গোরস্থান, বাদুড়, দেবদারু
> মৃত্যু, তুমি অঙ্গভঙ্গি/ মৃত্যু, তুমি রাসবিহারীর ট্রামলাইন
> মৃত্যু, তুমি মেয়েদের চুল-ভরা নীল কাঁচপোকা
> আমার বারোটা রোদ, আমার ঘোর আঁধার!"

'শবযাত্রী সন্দিগ্ধ' কবিতায় দেখি কবি এক জনৈক শবযাত্রীর মৃত্যুর কৃষ্ণরূপ দর্পণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে চাইছে। তাই তো কবিকে বলতে শুনি—

> "মরা পোড়াতে যাবো না বৈকুণ্ঠ আমরা কি মরবো না
> খোল ভেঙে দে বেতাল ঠেকায় চোখে টলছে হাজার চন্দ্রবোড়া
> কালরাতে যে সাতপহর গাওনা হলো... কেউ ডেকেছে। কেন।
> আমরা কেউ ম'রে গেলেই সঙ্গে যাবো তেমনটি করবো না।"

শক্তি চট্টোপাধ্যায় জানতেন জীবন ও মৃত্যুর অপরূপ বোঝাপড়াই মানব জীবনের অস্তিত্ব। জীবনের পায়ে পায়ে জড়িয়ে থাকে মৃত্যু। কথাতেই তো আছে 'জন্মিলেই মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে?' সে কথা তিনি ভালো ভাবেই জানতেন। সেই জন্যই তো তাঁর মনে হয়েছে মৃত্যুবোধ ব্যাতিরেকে জীবনবোধেরই বা অর্থ কী? মৃত্যুর হাত থেকে কেউ কখনও রেহাই পায়নি এবং পাবেও না অর্থাৎ মৃত্যুর হাত থেকে জীবিত কোনো প্রাণীরই রেহাই নেই। মৃত্যু তার কাছে জীবনাকাঙ্ক্ষারই নামান্তর যেন—

> "জীবনের কোলে বসে মরণের এই অবসাদ কবে শেষ হবে?"

'আমি স্বেচ্ছাচারী' কবিতাটিতে দেখি সাধারণ মানুষ এক অপরিচিত মৃতদেহ নিয়ে শুরু হয়েছে নানান জিজ্ঞাসা, কিন্তু সমুদ্র তার কল্লোলের অবাধ্য ধ্বনিময় সেসব জিজ্ঞাসার কোনো তোয়াক্কা করে না। সেখানে মৃত্যুই যেন এক সর্বগ্রাসী নিয়তি—

> "তীরে কি প্রচণ্ড কলরব
> জলে ভেসে যায় কার শব
> কোথা ছিল বাড়ি?
> রাতের কল্লোল শুধু বলে যায়– 'আমি স্বেচ্ছাচারী'

কবি ছিলেন মদ্যপায়ীয়। তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন—

> "মদের অনুপ্রেরণা ছাড়া কবিতার জন্ম দেওয়া যে অসম্ভব এমন একটা ধারণা তিনি প্রায়শই ব্যক্ত করেছেন।"[৮]

এক নিশীথ রাতের মদ্যপায়ীর টালমাটাল আপাত অসংলগ্ন স্বগত কথনে মৃত্যুর কথার বা জীবনরূপ মৃত্যুর এক অসাধারণ ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন—

> "সারবন্দী জানালা, দরজা, গোরস্থান- ওলোটপালট কঙ্কাল
> কঙ্কালের ভিতরে শাদা ঘুণ, ঘুণের ভিতরে জীবন, জীবনের ভিতরে মৃত্যু—সুতরাং
> মৃত্যুর ভিতরে মৃত্যু
> আর কিছু নয়!"

আবার কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় জানতেন প্রকৃতির নিয়মে উত্তরাধিকারীর হাতে সব কিছু সঁপে দিয়ে একদিন চিরবিদায় নিতে হবে। আবার তিনি একাকীত্বও বড় একটা পছন্দ করেন না। তাই যাওয়ার সময় তিনি সকলকে সঙ্গী হিসেবে নিয়ে যেতে চান। তবে অসময়ে নয়। এই জীবন রসিক কবিই আবার মৃত্যুর কথা ভাবেন। না ভেবে উপায় নেই, তাই ভাবেন—

> "মৃত্যুর কথা আমরা সকলেই জানি-মৃত্যুর হাত থেকে পার নেই,
> যেন তালকানা পাখি উড়ে এসে পড়বেই ফাঁদে।
> বড়ো ফাঁদ ছোট হবে, করতল-মুষ্টিতে এসে জমে যাবে।
> ভাগ্য রেখাগুলোর মতনই হয়ে যাবে স্বাধীনতাবিহীন, বন্দী।"

তিনি আবার মৃত্যুকে ভয়ও পেয়েছেন মৃত্যুভয় প্রসঙ্গে লেখা একটি কবিতা—

> "মৃত্যুরে পেয়েছি ভয়। মরে যাবো তোমাকেও ছেড়ে?
> একাকী, সমাজহীন। মানুষের করাঘাতে আর উঠি না জেগে এ কী ঘুম,
> অলক্ষণ, এ কী ভার স্মৃতির মৃত্যুর আগে, স্মৃতি কি বস্তুত যাবে ছেড়ে!
> তোমারে পেয়েছি ভয়, তুমিও তো মৃত্যুর পোশাক পরে নেবে..."

কবির জীবনের প্রতি গভীর ভালোবাসা থেকেই এই মৃত্যুভয়ের জন্ম হয়েছে। ভালোবাসা থেকেই জন্ম হয় সৌন্দর্যবোধের। আর সকল সৌন্দর্যের মর্মমূলে লুকিয়ে থাকে মৃত্যুর বীজ; সুন্দরের শরীরে তাই সর্বদাই বিষাদের স্পর্শ লেগে থাকে—

> "সকল সুঠাম বৃক্ষে মৃত্যু ও স্তব্ধতা ঢাকা আছে।"

আবার জীবন রসিক তথা প্রেমিক কবি মৃত্যু সম্পর্কে ভয়ের পাশাপাশি কিভাবে মৃত্যুকে খারিজ করে দেওয়া যায় না বলে নিরুপায় হয়ে বলেছেন—

> "শ্মশানের কোনো দরজা নেই—তাহলে বন্ধ করে দিতুম
> শ্মশানের নেই তালাচাবি – তাহলে হারিয়ে ফেলতুম।"

মানুষখেকো চকিত বাঘের হানাদারির চিত্রকল্প হিসেবে চিতাগ্নির গ্রাস করার বিবরণ দিয়েছেন কবি। অগ্রজ কবি নবেন্দুর স্মৃতিতে লিখেছেন -

> "বিষণ্ণ বাঘের মতো অগ্নি এসে তার নীল ঝোপে কবিকে টেনেছে আজ।"

আবার উপমার চিত্রকল্পের সাহায্যেও মৃত্যুর ছবি এঁকেছেন কবিতার মধ্যে —

> "মৃত্যু এসে দাঁড়াবে এখানে
> পুলিশের মতো স্পষ্ট।"

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 50
Website: https://tirj.org.in, Page No. 450 - 459
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

মৃত্যুর অনিবার্যতা, জীবনের সীমা ছাড়িয়ে মৃত্যুর ব্যপ্তি। মৃত্যুর মধ্য দিয়েই মানুষ ফিরে যায় তার উৎসমুখে, কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় এইসব ভাবনার মূল্যবান বিবৃতি দিয়েছেন–

"সমস্ত মানুষ, শুধু আসে বলে যেতে চায় ফিরে।
মানুষের মধ্যে আলো, মানুষেরই ভূমধ্য তিমিরে
লুকোতে চেয়েছে বলে আরো দীপ্যমান হয়ে ওঠে–
...যে যায় সে দীর্ঘ যায়, থাকা মানে সীমাবদ্ধ থাকা।"

কবির কবিতায় 'যাত্রা'র কথা পাই, তবে সে যাত্রা জন্ম থেকে জীবনের মধ্য দিয়ে মৃত্যুর দিকে যাত্রা। মৃত্যুই ঐ পথযাত্রীর অবশ্যম্ভাবী গন্তব্য। আর সেই কারণেই তিনি মৃত্যুকে গ্রহণ করেছেন জীবনের বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার চড়াই উৎরাইয়ের মধ্য দিয়ে। এই জন্ম ও মৃত্যুর দুই প্রান্তবিন্দুর যাত্রাপথের অবিরাম চলার বৃত্তান্ত শুনি 'পরশুরামের কুঠার' গ্রন্থের 'তুমি আছো ভিতের ওপর আছে দেয়াল' কবিতায়–

"মৃত্যুর অনেক আগে জন্মেছি আমরা
জন্মের আগে মৃত্যুর কাছে যেতে হলে পথ
পথ ফেলে যেতে হবে আমাদের। সেখানে মাইলপোস্ট নেই,
নেই টেলিগ্রাফ-তার। মৃত্যুর কাছে যেতে হলে পথ-পথের পরে পথ ফেলে যেতে হবে আমাদের।"

কবির মনে হয়েছে মৃত্যুর জন্য মানসিক প্রস্তুতি প্রয়োজন। যাওয়ার সময় মানুষ জীবনের প্রতি সহজ মায়া ও মমতা ত্যাগ করা উচিৎ তাহলে জীবন অত্যন্ত সহজ হবে। মৃত্যুর প্রসঙ্গ জীবনবোধের সূচক হিসেবে তুলে ধরেছেন তাঁর কবিতায়–

"যাবার আগে বোঝা হালকা রাখাই রীতি
নইলে যে বাহকদেই কষ্ট।।"

মৃত্যু জীবনের এক অনিবার্য পরিনাম। মৃত্যু তো প্রতিটা জীবেরই ঘটে। তা বলে কী মৃত্যুতেই জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে? তাই কিন্তু একদমই নয়। কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় মৃত্যুকেই জীবনের পরিসমাপ্তি বলে মনে করেননি। এজন্যই তো তাঁর ঘোষণা– 'মৃত্যুর পরেও যেন হেঁটে যেতে পারি'। মৃত্যু তাঁর কাছে ভীতিপ্রদ হলেও সুন্দর এক মৃত্যুর কথাও তিনি বলেছেন–

"মৃত্যুর কাছে আমার মৃত্যুর বিকল্প কিছু দেবার ইচ্ছে বহুকালের। বিকল্প সে মৃত্যুর চেয়ে কঠিন আর ভয়ঙ্কর কিছু হবে। আমি যে মৃত্যুর কথা বলি– সেই মৃত, তথাকথিত মৃত্যুর পরেও বেঁচে থাকবে। ভূত হয়ে নয়। বিভীষিকা হয়ে নয়। এও এক ধরনের সুন্দর।"[৯]

মৃত্যুর রহস্য মণ্ডিত সৌন্দর্যের হাতছানিতে আকৃষ্ট হয়ে কবি বলেছেন 'যেতে পারি, কিন্তু কেন যাবো'র পূর্বাভাস আগেই ধ্বনিত হয়েছিল তাঁর এই আত্মকথনের মধ্য দিয়ে–

"কেন অবেলায় যাবে? বেলা হোক, ছিন্ন করে যেও
সকল সম্পর্ক।"

কবি ছিলেন বোহেমিয়ান জীবনযাপনে মগ্ন। তাই মৃত্যুও কবির কাছে ভ্রাম্যমাণ পথিকের নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে–

"যেতে যেতে এক-একবার পিছন ফিরে তাকাই, আর তখনই চাবুক
তখনই ছেড়ে দেওয়ার সব আগুন লাগলে পোশাক যেভাবে ছাড়ে
তেমনভাবে ছেড়ে যাওয়া সব
হয়তো তুমি কোনোদিন আর ফিরে আসবে না- শুধু যাওয়া।"

কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় তাঁর প্রিয়বন্ধু বা অগ্রজ কবি সাহিত্যিকদের স্মরণে বেশকিছু শোককবিতা লিখেছেন যাকে এক কথায় এলেজি বলা যেতে পারে। যা নিয়ে একটি সংকলনও গড়ে ওঠেছে। এই সংকলন সম্পর্কে কবি পত্নী মীনাক্ষী চট্টোপাধ্যায় বলেছেন—

> "মৃত্যু কবিকে খুব সহজেই স্পর্শ করতো, এবং প্রিয়জনের মৃত্যুতে খুব সাবলীলভাবে একটি একটি কবিতা উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে নিবেদন করে তিনি স্মৃতিতর্পণ করতেন।"[১০]

মৃত্যুর নিঃসঙ্গতা থাকলেও শক্তির এলেজিগুলো সুনির্দিষ্টভাবে মৃত্যুর কবিতা নয়। বরং জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যে জীবন তারই বেদনাদায়ক অনুভব শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় মৃত্যুর অভিজ্ঞতাকে বারবার পথিক ও তাঁর যাত্রার চিত্রকল্প হিসেবে তুলে ধরেছেন। ঐ সংকলনে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্মরণ করে এক অনবদ্য এলেজি রচনা করেছেন—

> "মানুষ তোমারি বাঁশি শুনেছিলো প্রিয় অর্ফিয়ুস তুমি জেনে গেলে সব
> তোমার মৃত্যুর পর আমাদের ফুলে- ভরা টব
> লুণ্ঠনের দাগ মেখে আজো তো ছাদেই পড়ে আছে
> ভালোবাসা ছিলো খুব কাছে/ ভালোবাসা ছিলো খুব কাছে।"

এখানে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনো ব্যক্তি পরিচয় দেননি। এবং তাঁর প্রতি এলেজি লেখকদের মতো কোনও শ্রদ্ধাজ্ঞাপনও নেই। বরং বলা যায় কবির নিজস্ব মৃত্যুভাবনা থেকেই এ রচনার জন্ম হয়েছে। আবার মৃত্যু নিয়ে কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় সত্যি কথাকে অকপটেই স্বীকার করে নিয়েছেন। 'মৃত্যুর পরেও যেন হেঁটে যেতে পারি' কবিতায় বলতে শুনি।

> "মানুষের মৃত্যু হলে মানুষের জন্যে তার শোক
> পড়ে থাকে কিছুদিন, ব্যবহৃত জিনিসেরা থাকে
> জামা ও কাপড় থাকে, ছেঁড়া জুতো তাও থেকে যায়
> হয়তো বা পা-দুখানি রাঙা হলে পদচ্ছাপ থাকে"

যে যায় সে চলে যায় ফেলে যায় শুধু জীবৎকালের কিছু এলোমেলো স্মৃতি চিহ্নমাত্র। সেই সমস্ত নিয়েই বিক্ষিপ্তভাবে আলোচনা চলতে থাকে নামমাত্র। মৃত ব্যক্তিটির সমগ্র দিক নিয়ে কখন ও আলোচনা হয় না, বা হতে পারে না। আমারা আরও বেশি শিহরিত হই যখন পড়ি।

> "দক্ষিণ-দুয়ারে এসে দাঁড়াবে নির্ঘাৎ
> চতুর্দোলা নিয়ে যম-
> অপমান লাগে...
> মৃত্যুর পরেও যেন হেঁটে যেতে পারি।।"

আসলে আমাদের বুঝতে কোনো অসুবিধাই হয় না যে এগুলো মৃত্যুর অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখা জীবনের প্রতি গভীর মমতা ও দায়বদ্ধতার এক বিস্ময় অভিমান ছাড়া কিছুই নয়। জীবনের প্রতি প্রবল মায়া ও মমতা ছিল শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের অন্যতম মূলমন্ত্র। তাই তো তিনি মৃত্যুর পরেও মানুষের ফিরে আসার কথা বলেছেন—

> "মানুষের কিছু কাজ বাকি থাকে, মৃত্যুর পরেও
> তাকে ফিরে আসতে হয়, বাসা খুঁজে মানুষের মতো।"

'পথ' শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের চিত্রকল্পগুলির মধ্যে অন্যতম। প্রাত্যহিকতার দুঃখ বেদনা ভুলে এক মৃত্যুরূপ মোহনার দিকে বা অনন্ত ঐক্যের দিকে ভেসে চলার নামই তো জীবন, যা কবি 'হেমন্তের অরণ্যের আমি পোস্টম্যান' গ্রন্থের 'কোন পথে' কবিতায় দেখি সেই চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন—

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 50
Website: https://tirj.org.in, Page No. 450 - 459
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

"একটা বিষয় গোড়া থেকেই স্থির থাকা দরকার।
কোন পথে? কোন পথে গেলে আর আমাদের ফিরে আসতে হবে না
আমরা যারা একবার বেরিয়ে এসেছি। তাদের আর ফিরে যাওয়া চলে না
পথ বেরিয়ে প্রান্তরে পড়ে, নদী বেরিয়ে সমুদ্র— এই তো নিয়ম।
আমরা নিয়ম মাফিক পথ, পথ থেকে প্রান্তরে গিয়ে হাজির,
নদী থেকে সমুদ্রে।"

কবি একসময় বামপন্থী রাজনৈতিক দলের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েন। নকশালবাড়ি আন্দোলনেও সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। নকশালবাড়ি আন্দোলনের উত্তাল হাওয়া ও আগ্নেয়ময় পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল চারিদিকে। সেই পরিস্থিতির মধ্যেও কবির কাছে মৃত্যু এক স্বতন্ত্র তাৎপর্যে ধরা দিয়েছিল। 'হত্যা-সন্ত্রাস-ক্লান্তিও স্থবিরতা' ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে মৃত্যুকে দেখেছিলেন এক ইতিবাচক ব্যঞ্জনায়; যেমন -

ক) "বিমূঢ়তা থেকে ওঠে মৃত্যুর মহান জাতিস্মর।"
খ) "অন্যেরা ঘুমায় আজ ক্লান্ত শুধুমাত্র বেঁচে থাকে
মৃত্যুর দাক্ষিণ্যহীন যেন দীর্ঘ দেবদারু বীথি।"
গ) "দিন যাচ্ছে, যাবে
প্রকৃত কি যাচ্ছে দিন? থেমে নেই? স্থবিরতা নেই?
মৃত্যুর মহান আসে জীবনের তুচ্ছতার কাছে।"

প্রথম দিকে কবির জীবনের প্রতি গভীর ভালোবাসা থাকলেও শেষের দিকে আসক্তি ও উদাসীনতার দ্বৈরথ হিসেবে কবিতায় ঘর ও বাহির, বন্ধন ও মুক্তির আশ্চর্য লীলাক্ষেত্র তৈরি করেছিলেন তাও ছড়িয়ে আছে কবির কবিতার মধ্যে— 'মন্ত্রের মতন আছি স্থির' গ্রন্থের নাম কবিতায় কবি ঘরে ফেরার কষ্ট, নিজেকে নষ্ট করে ফেলার যন্ত্রণা, শ্মশান চিতার স্বাগত সংকেত, সন্তানদের জন্য অনুতাপ সবকিছু মিলেমিশে খুব বাজে অনুভুতি তৈরি হয়েছে, যা তিনি এইভাবে ব্যক্ত করেছেন—

"জীবনের উপরে ক্রোধ নিজেই জানি না
সে কারণে কষ্ট বেশি, নষ্ট হতে কষ্ট বেশি লাগে
...স্বাগত জানায় দূরে শ্মশানের ধোঁয়া
ক্রমশ পোড়ায় গন্ধ...
গঙ্গানদী, মন্ত্রপাঠ, চেলাকাঠ আর/ পরম কর্তব্যরত সন্তানের মুখ...
কষ্ট, যা ওদেরি জন্যে, নষ্ট হয়ে গেলে
কষ্ট যা ওদেরি জন্যে... বড়ো অভিমান।"

সংসারবিমুখ বোহেমিয়ানার মধ্যে দিয়ে মধ্যবয়স পেরোনো কবি যেন আসন্নসম্ভব মৃত্যুর দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে পরম মমতাময় কর্তব্য নিয়ে তাকাতে চাইছেন আত্মজদের দিকে। অনির্দিষ্ট কিছুর প্রতি পশ্চাদ্ধাবন করতে করতে কবি তাঁর সব পিছুটানকে হারাতে বসেছিলেন, ঠিক তখনই কেউ যেন প্রত্যাবর্তনের সঞ্জীবনী মন্ত্র শোনায়—

"শুধু প্রায় স্পষ্ট ঘূর্ণি, কথা বলে-
মৃত, দাগী তুমি/ পোড়া কাঠ ছুঁয়েছে কপাল...
ফিরে যাও/ এখনও সময় আছে, ফিরে গেলে সুসময় পাবে।"

পরিণত বয়সে এসেও শক্তির ভেতরে সর্বদাই ঘুরে বেড়িয়েছে তাঁর বাল্যকালের স্মৃতি, বালক বয়েসের এক প্রতিমূর্তি। মৃত্যুকে তাই তিনি দেখেছেন বালকের মতো, বাল্যখেলার চিত্রকল্পে মৃত্যুকে ফুটিয়ে তুলেছেন—

"মৃত্যু যেন কানামাছি খেলে।
চোখবন্ধ ছেলেমেয়েদের খেলা এই ভুবনডাঙায়
কখনো আমাকে ছোঁয়, কখনো তোমাকে ছুঁয়ে দেয়...
...ভেতরে রয়েছে তারও প্রিয় ও অপ্রিয় বেছে নেবে, বিদায় জানাবে"

জীবনের শেষ প্রান্তে এসে 'মৃত্যু' সম্পর্কে ক্ষোভ কিংবা অভিমান কিছুই নেই; জীবনের সমস্ত লাভ-ক্ষতি ও আশাহীনতা থেকে চিতার কোলে আশ্রয় নিতে চেয়েছিলেন—

"নদীতে অনেক স্রোত, এ বয়সে তার সঙ্গে যোঝা খুবই শক্ত,
দেহকূপে অবাধে ঢুকছে
ঘুণ কুরে কুরে খায়...
যমেও নেয় না তাকে, আমাদের বুড়ী ঠাকুরমাকে
নেয়, দিতে পারলে নেয়, চিতা মাতৃমুখী।"

একদা স্বেচ্ছাচারী ও ভ্রাম্যমাণ চঞ্চল কবি চিরপ্রণম্য অগ্নির তাপস্পর্শ পেতে জীবনের আবেদন ব্যক্ত করেছেন 'চন্দন'এর প্রতীকে—

"পায়ের নখর থেকে জ্বালিও না শিখর অবধি
আমি একা, বড়ো একা, চন্দনের গন্ধে উতরোল।"

'যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো' কবিতায় কবি বলেছিলেন 'একাকী যাবো না অসময়ে...সন্তানের মুখ ধরে চুমু খাবো' অথচ সেই কবি অকপটেই আবার স্বীকার করে নিয়েছেন কঠিন সত্যকে। সন্তানের মুখচুম্বন ফেলে রেখে তাঁকে ঠিক চলে যেতেই হবে এবং সে যাত্রায় নিঃসঙ্গতাই একমাত্র সঙ্গী। এ কথা ভেবে তিনি আবার বলেছেন—

"আমি যাবো সঙ্গে নিয়ে যাবো না কারুকে
একা যাবো।"

দীর্ঘ রোগশয্যার বিষণ্ণতার ও মৃত্যু ভাবনা ছড়িয়ে আছে 'আমাকে জাগাও' সংকলণের মধ্যে। আর সেই কারণেই দহন, চিতাগ্নি ও জীবনের সাথে মিশে থাকা বিভিন্ন উপকরণকে মৃত্যুর প্রসঙ্গ হিসাবে পাই 'হারায় না' কবিতাটির মধ্যে—

"তুমি গোটা জীবনে যা জ্বলতে পারতে আমিও জ্বলেছি
জ্বলেছি বলেই আছি, জ্বলন্ত সংসারে এক স্তব,
স্তবের মতন আছি, মৃত্যুময় বহু অনুভব
স্পর্শ করে, চিতা নম্র, তবুও তো চিতায় জ্বলেছি।"

অগ্রজ লেখক সন্তোষকুমার ঘোষকে রোগগ্রস্থ অবস্থায় দেখে একটি এলেজি কবিতা লিখেছেন—

"কীভাবে মুহূর্তে করছো, বিলাপ করছো না
হেসে হেসে বলছো, দ্যাখ জীবনে একবারই মৃত্যুর নিকটে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছি!
কে যে কার সন্নিকট বলাও মুশকিল..."

বার্ধক্যজনিত শারীরিক ক্ষয় ও দূর্বলতার সংকেত পেয়েছেন তিনি এবং অপেক্ষায় আছেন অন্তিম যাত্রার—

"গায়ের চামড়া হয়েছে লোল, মুখের ভাঁজে বলিরেখা,
স্থবিরতার বাতাস বইছে দেহজোড়ের সমস্ত দিক...

...সময় হয়ে আসছে এখন নদীর জলে ভেসে যাবার
...পারান্ত কই? সেই যেখানে কিছুক্ষণের শান্তি পাবো।"

এখানে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার শুধুমাত্র মৃত্যু প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করা হলেও বাংলা কবিতার জগতে তিনি এক বিশাল সাম্রাজ্য সৃষ্টি করে গেছেন এবং আগামীতেও তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

Reference:

১. চট্টোপাধ্যায়, শক্তি, পদ্য সমগ্র, এই সব পদ্য, যুগলবন্দী, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ১৯, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃ. ১১
২. নন্দী, শাওন, 'পঞ্চাশ কবিতার নয়াচর', প্রথম প্রকাশ মে, ২০১২, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা, পৃ. ২৫৮
৩. নন্দী, শাওন, 'পঞ্চাশ কবিতার নয়াচর', প্রথম প্রকাশ মে, ২০১২, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা, পৃ. ২৫৮
৪. নন্দী, শাওন, 'পঞ্চাশ কবিতার নয়াচর', প্রথম প্রকাশ মে, ২০১২, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা, পৃ. ২৫৬
৫. ঘোষ, শঙ্খ, 'এই শহরের রাখাল', দেশ ২০ মে ১৯৯৫, পৃ. ২৭
৬. বিচিত্রা বিনোদন, ১৮ এপ্রিল ১৯৯৫, পৃ. ৫১-৫২
৭. এলিয়ট, টি এস, ইস্ট কোকার (ফোর কোয়াবটেটস), অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটি প্রেস, ১৯৪৪, পৃ. ২০
৮. মিশ্র, ড.অশোক, 'আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা (১৯০১-২০২০), পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত তৃতীয় দে'জ সংস্করণ, অক্টোবর ২০২০, আশ্বিন ১৪২৭, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ. ৩৬১
৯. চট্টোপাধ্যায়, শক্তি, পদ্য সমগ্র (৩), আমিও শীর্ষক কবিতার টীকা অংশ, পৃ. ২০৯
১০. চট্টোপাধ্যায়, শক্তি, পদ্য সমগ্র (৫), পৃ. ৩০৭